৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) মধ্য যুগের ভারতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা লেখো।

(খ) কবীরের ভক্তি ভাবনায় কীভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এক হয়ে গিয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

(গ) বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলাফল কী হয়েছিল বিশ্লেষণ করো।

(ঘ) বাদশাহ আকবরের দীন-ই ইলাহি সম্বন্ধে একটি টীকা লেখো।

(ঙ) মুঘল সম্রাটদের আমলে বাগান তৈরি এবং দুর্গনির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

(চ) মধ্য যুগের বাংলার স্থাপত্যরীতির পর্যায়গুলির মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

(ছ) মুঘল চিত্রশিল্পের উন্নতিতে মুঘল বাদশাহদের কী ভূমিকা ছিল ?

(জ) মধ্য যুগের ভারতে কীভাবে ফারসি ভাষার ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা বেড়েছিল তা বিশ্লেষণ করো।

(ঝ) সুলতানি এবং মুঘল আমলে সামরিক এবং কৃষি প্রযুক্তিতে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয়?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) রাজনীতি, জীবনযাপন এবং ধর্ম নিয়ে একজন সুহরাবর্দি সুফি সাধকের সঙ্গে কবীরের কাল্পনিক সংলাপ লেখো।

(খ) মনে করো তুমি চৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপের একজন সাধারণ মানুষ। তুমি দেখলে চৈতন্যদেব নগরসংকীর্তনে বেরিয়েছেন। তুমি কী করবে?

(গ) যদি তুমি মুঘল কারখানার একজন চিত্রশিল্পী হতে তা হলে বাদশাহের সুনজরে পড়ার জন্য তুমি কী কী ছবি আঁকতে?

(ঘ) ধরো তুমিই আজ তোমার শ্রেণির শিক্ষিকা/শিক্ষক। তুমি বাংলা ভাষায় আরবি এবং ফারসি শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে পড়াচ্ছ। রোজকার বাংলা কথাবার্তায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের একটি তালিকা তুমি ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে চাও। এমন একটি তালিকা তুমি তৈরি করো। দরকারে একটি বাংলা অভিধানের সাহায্য নাও।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট

৮.১. গোড়ার কথা

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট বুঝতে হলে কেন ঐ সংকট তৈরি হয়েছিল তা জানা দরকার। তার জন্য ঐ সময়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন লক্ষ করতে হবে। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্য অনেক বড়ো হয়ে পড়েছিল এবং মনসব নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে মারাঠাদের মতো এক আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এরা মুঘলদের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে। শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এতদিন ধরে মুঘলরা নিজেদের যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই ধারণায় আঘাত করা হয়। এই অধ্যায়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে এই আঞ্চলিক শক্তিগুলির প্রতিরোধের কথাই আমরা পড়ব।

এই প্রতিরোধগুলির চরিত্র ছিল এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। মারাঠারা নিজেদের স্বরাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল। জাঠ এবং সৎনামি বিদ্রোহ মুঘল আমলে কৃষিব্যবস্থার সংকটের দিকটি তুলে ধরেছিল। আঞ্চলিক স্বাধীনতা এরা সকলেই চেয়েছিল। তবে এই আন্দোলনগুলিকে ধর্মীয় প্রতিরোধ বলা কিন্তু ঠিক নয়।

৮.২ শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র

যুদ্ধপটু মারাঠাদের বাস ছিল পুণে এবং কোঙ্কণ অঞ্চলে। তারা অনেকেই বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডার রাজদরবারে উচ্চপদে ছিল। কিন্তু তাদের কোনো নিজস্ব রাজ্য ছিল না। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে শিবাজি মারাঠাদের জোটবদ্ধ করেছিলেন।

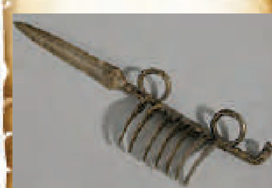

ছবি ৮.১ : বাঘ নখ

শিবাজির (জীবনকাল ১৬৩০-'৮০ খ্রিঃ) বাবা শাহজি ভোঁসলে বিজাপুরের সুলতানের জায়গিরদার ছিলেন। শিবাজি তাঁর মা জিজাবাঈ এবং শিক্ষক দাদাজি কোণ্ডদেবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিজাপুরের সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে শিবাজি বিজাপুরের বেশ কিছু জমিদারকে নিজের দলে নিয়ে আসেন। সুলতান শিবাজিকে দমন করতে আফজল খানকে পাঠান। আফজল খান শিবাজিকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সতর্ক শিবাজি উল্টে বাঘনখ নামের একটি অস্ত্র দিয়ে আফজল খানকেই হত্যা করেন। শিবাজির ক্ষমতাবৃদ্ধি

ঔরঙ্গজেবের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। শিবাজি দু-বার বন্দরনগরী সুরাট আক্রমণ করে লুঠপাট করেন। ঔরঙ্গজেব শিবাজিকে দমন করতে শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম এবং মির্জা রাজা জয়সিংহকে পাঠান। জয়সিংহ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে শিবাজিকে পুরন্ধরের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী শিবাজি মুঘলদের ২৩টি দুর্গ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মনে রেখো, সে যুগে দুর্গ ছিল নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান স্তম্ভ। এরপর শিবাজি আগ্রার মুঘল দরবারে পৌঁছলে তাকে অপমান করা হয়। তাঁকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করা হয়। শিবাজি একটি ফলের ঝুড়িতে লুকিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। দাক্ষিণাত্যে পৌঁছে মুঘলদের সঙ্গে আবার শিবাজির দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থান ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে একটি বড়োসড়ো প্রতিরোধ আন্দোলন। শিবাজি একটি সুপরিকল্পিত এবং স্বাধীন শাসনব্যবস্থার সূচনা করেন। রায়গড়ে তাঁর অভিষেক হয় (১৬৭৪ খ্রিঃ)। অর্থাৎ, অন্যান্য মারাঠা সর্দারদের থেকে তিনি যে আলাদা সেটাই প্রমাণিত হলো। তাঁর আটজন মন্ত্রীকে বলা হতো অষ্টপ্রধান। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পেশওয়া। মারাঠারা নিজেদের রাজ্যকে বলত স্বরাজ্য। স্বরাজ্যের বাইরে মারাঠা সেনারা আশপাশের মুঘল এলাকাগুলি আক্রমণ করে সেখান থেকে কর আদায় করত। যেসব সৈনিক মারাঠা রাজ্যে স্থায়ীভাবে চাকরি করত তাদের বলা হতো বর্গি। শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে।

টুকরো কথা

মাবলে ও পেশওয়া

শিবাজি এক সময় পুণের আশপাশের অঞ্চলগুলি আক্রমণ করছিলেন। তখন তিনি মাওয়াল অঞ্চল থেকে এক দল পদাতিক সেনা সংগ্রহ ও নিয়োগ করেন। এদের বলা হতো মাবলে বা মাওয়ালি। এরা তাঁর সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

শিবাজির মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে পেশওয়াদের হাতেই শাসন ক্ষমতা চলে আসে। তখন মুঘল শাসনের বড়োই দুর্দিন। শিবাজির মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে পেশওয়া প্রথম বাজীরাও হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই হিন্দু রাজ্যের আদর্শকে বলা হয় হিন্দুপাদপাদশাহি। অর্থাৎ তিনি চাইলেন ধর্মের নামে মুঘলদের বিরুদ্ধে অন্য রাজাদের জোটবদ্ধ করতে।

মানচিত্র ৮.১ : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

শিখ শক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র

শিখদের সঙ্গে জাহাঙ্গির এবং শাহজাহানের আমলে মুঘলদের সংঘাত হয়। এই সংঘাতের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। শিখরা তাদের গুরুর প্রতি অনুগত ছিল। তাই নিয়ে অনেক সময় মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে শিখদের সংঘাত বেঁধে যেত। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের শেষের দিকে চতুর্থ গুরু রামদাসের ছেলে অর্জুনদেব শিখদের গুরু হন। এই সময় থেকেই শুরু হলো বংশানুক্রমিকভাবে গুরু নির্বাচন করা। গুরু অর্জুনের ছেলে গুরু হরগোবিন্দ একসঙ্গে দুটি তলওয়ার নিতেন। তিনি বোঝাতে চাইতেন যে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁর আছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছ, শিখদের উত্থান অনেকটাই একটা স্বাধীন শক্তির উত্থানের মতোই হয়ে

উঠেছিল। মুঘল সরকারের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। নবম শিখ গুরু তেগবাহাদুর ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু শুধু ধর্মীয় কারণেই মুঘল-শিখ সংঘাত হয়নি। এ কথাও প্রচলিত যে তেগবাহাদুর এক পাঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাঞ্জাবে মুঘল শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন। তেগবাহাদুরকে বন্দী করে মুঘলরা হত্যা করে। এই ঘটনার পর শিখরা পাঞ্জাবের পাহাড়ি এলাকায় চলে যায় এবং সেখানেই দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

টুকরো কথা

খালসা

১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে গুরু গোবিন্দ সিংহ খালসা নামক একটি সংগঠন তৈরি করেন। খালসার কাজ ছিল শিখদের নিরাপদে রাখা। সামরিক প্রশিক্ষণ শিখদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ছিল। গুরু গোবিন্দ সিংহই শিখদের 'পন্থ' বা পথ ঠিক করে দেন। গুরু তাদের পাঁচটি জিনিস সবসময় কাছে রাখতে বলেন। এই পাঁচটি জিনিসের নামই 'ক' অক্ষর দিয়ে শুরু। এগুলি হলো—কেশ, কঙ্ঘা (চিরুনি), কচ্ছা, কৃপাণ এবং কড়া। এছাড়াও খালসাপন্থী শিখরা 'সিংহ' পদবি ব্যবহার করতে শুরু করল। পাহাড়ি হিন্দু রাজাদের সঙ্গে শিখদের মাঝে মধ্যেই ছোটোখাটো যুদ্ধ চলত। শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হিন্দু রাজারা মুঘল সরকারের সাহায্য চেয়েছিল। মুঘলদের পক্ষেও শিখ সামরিক শক্তির উত্থান মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিখদের সংঘাতের চরিত্র ছিল মূলত রাজনৈতিক। গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য বান্দা বাহাদুর লড়াই চালিয়ে যান।

গুরু গোবিন্দ সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। শিখ ধর্মীয় আন্দোলন মানুষের মধ্যে সমতার কথা বলত। তবে অনেক সময় সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে এটি একটি প্রতিরোধী আন্দোলন হিসাবে রাজনৈতিক রূপ নিত।

অন্যান্য কয়েকটি বিদ্রোহ

দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলের জাঠরা ছিল প্রধানত কৃষক। তাদের মধ্যে অনেকে আবার জমিদারও ছিল। রাজস্ব দেওয়া নিয়ে জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে তাদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত হতো। ঔরঙ্গজেবের আমলে তারা স্থানীয় এক জমিদারের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে। জাঠরা একটি পৃথক

রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিল। মুঘলদের বিরুদ্ধে জাঠ প্রতিরোধ ছিল একদিকে কৃষক বিদ্রোহ অন্যদিকে একটি আলাদা গোষ্ঠীপরিচয়ে জাঠরা একজোট হচ্ছিল। মথুরার কাছে নারনৌল অঞ্চলে এক দল কৃষক মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। এরা ছিল সৎনামি নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান উপজাতিরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

এই সমস্ত বিদ্রোহগুলি আসলে মুঘল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন। তাছাড়া ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে কৃষি সংকটও বেড়ে গিয়েছিল। সেটিও ছিল এই বিদ্রোহগুলির একটি কারণ।

৮.৩ জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট : কারণ ও প্রভাব

শাহ জাহানের সময় থেকেই মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই মনসবদারদের তাদের পদ অনুযায়ী যা বেতন পাওয়ার কথা, তা দেওয়া যেত না। অনেক সময় আবার কৃষক বিদ্রোহের কারণে রাজস্ব আদায় করা যেত না। এছাড়া দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করাও সবসময় সম্ভব হচ্ছিল না। মনসবদারেরা বেতন না পেলে তাদের যতজন ঘোড়সওয়ারের দেখাশোনা করার কথা, ততজনের দেখাশোনা করা যেত না। অর্থাৎ খাতায় কলমে হিসাবের সঙ্গে আসলে যা হচ্ছে, তার তফাত বেড়েই চলেছিল। ঔরঙ্গজেবের সময় এই সমস্যা আরও বেড়েছিল।

জায়গিরদারি এবং মনসবদারি সংকটের সঙ্গে যুক্ত সে যুগের কৃষি সংকট। এই সময় ফসলের উৎপাদন বেড়েছিল। কিন্তু কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের সময়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য মুঘল মনসবদাররা মারাঠা সর্দারদের সাহায্যও নিত। তার মানে ঐ সব অঞ্চলে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ আলগা হয়ে গিয়েছিল। এদিকে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে আবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে অভিজাতরা চাইলেন জমি থেকে তাদের আয় আরও বাড়াতে। তারা জমিদার এবং কৃষকদের উপর চাপ বাড়াতে থাকে। কৃষকরাও বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়। অনেক সময় জমিদাররাও তাদের মদত দিত।

কোনো কোনো সময়ে কৃষকরা রাজস্ব না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত। তখন তাদের জমিতে চাষ হতো না। চাষ না হলে রাজস্ব আদায় করা যাবে না। তাই যে সব মনসবদার এই সব জমিতে জায়গির পেত, তারাও ভালোভাবে ঘোড়সওয়ারের ভরণপোষণ করতে পারত না।

ঔরঙ্গজেব বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডা জয়ের পর দাক্ষিণাত্যের বিশাল অঞ্চল মুঘলদের হাতে এসেছিল। ঐ অঞ্চলের সব থেকে ভাল জমিগুলি

পড়ার মাঝে মজার কাজ

ভেবে বলোতো কৃষি সংকট বলতে কী বোঝায়?

টুকরো কথা

মুঘল দরবারে দলাদলি

সপ্তদশ শতকের শেষে মনসবদারদের মধ্যে ভালো জায়গির পাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র ও লড়াই শুরু হলো। দরবারি রাজনীতিতে ইরানি, তুরানি, মারাঠা, রাজপুত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত শুরু হলো। মনসবদারি এবং জায়গিরদারি সংকটের জন্য কোনো একজন মুঘল শাসক দায়ী ছিলেন না। অনেকদিন ধরে নানা সমস্যা জট পাকিয়ে ওই সংকট তৈরি করেছিল।

ঔরঙ্গজেব খাস জমি বা খালিসা হিসাবে রেখেছিলেন। সেগুলি জায়গির হিসাবে দেওয়া হতো না। খাস জমির রাজস্ব সরাসরি কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হতো। সুতরাং, জমির অভাব ছিল না তবে জায়গির হিসাবে দেওয়া যায়, এরকম ভালো জমির পরিমাণ কমে গিয়েছিল। মুঘল শাসকেরা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়াতে পারেননি। ফলে এই সমস্যা আরো গভীর হয়েছিল।

বলো তো ভালো জমিগুলি কেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব খাস জমি করে রেখেছিলেন?

টুকরো কথা

মুঘল সাম্রাজ্যের চরিত্র

মুঘল সাম্রাজ্য কতটা শক্তিশালী ছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক আছে। এক দল ঐতিহাসিক মনে করেন যে মুঘলরা ছিল দারুণ বলশালী। তাদের তৈরি করা সাম্রাজ্যের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের বীজ। আসমুদ্রহিমাচলে ছড়িয়ে ছিল মুঘলশক্তির ক্ষমতা। আরেক দল ঐতিহাসিক মনে করেন যে মোটেও মুঘলরা এতটা ক্ষমতা রাখত না। তাঁদের একজনের মতে মুঘল সাম্রাজ্যকে এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিশ্ছিদ্র গালিচার সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। বরং মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দেওয়া একটা কম্বল হিসেবেই ভাবা ঠিক হবে। উত্তর ভারতে মুঘলদের আধিপত্য থাকলেও অন্যান্য অঞ্চলে তাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

ছবি ৮.২ : মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খানের শিবিরে শিবাজির অতর্কিত হামলার দৃশ্য। জানালা দিয়ে পালানোর সময় শায়েস্তা খানের হাতের আঙুল শিবাজির তলওয়ারের কোপে কাটা যায়। ঘটনার স্থান পুণে, সময় ১৬৬৩ খ্রি:।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১. নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও:

(ক) পুণে, কোঙ্কণ, আগ্রা, বিজাপুর।

(খ) বান্দা বাহাদুর, আফজল খান, শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম।

(গ) অষ্ট প্রধান, বর্গি, মাবলে, খালসা।

(ঘ) রামদাস, তেগবাহাদুর, জয়সিংহ, হরগোবিন্দ।

(ঙ) কেশ, কৃপাণ, কলম, কঙ্ঘা।

২. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
রায়গড়	নারনৌল
হিন্দুপাদপাদশহি	শিবাজি
গোলকোন্ডা	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত
সৎনামি	প্রথম বাজীরাও
পাঠান উপজাতি	দাক্ষিণাত্য

৩. সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও:

(ক) ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে কী কী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল?

(খ) কবে, কাদের মধ্যে পুরন্দরের সন্ধি হয়েছিল? এই সন্ধির ফল কী হয়েছিল?

(গ) জাঠদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত কেন বেঁধেছিল?

(ঘ) শিবাজির সঙ্গে মুঘলদের দ্বন্দ্বের কারণ কী ছিল?

(ঙ) বিজাপুর ও গোলকোন্ডা জয়ের ফলে মুঘলদের কী সুবিধা হয়েছিল?

৪. বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও:

(ক) মুঘলদের বিরুদ্ধে শিখরা কীভাবে নিজেদের সংগঠিত করেছিল?

(খ) মুঘল যুগের শেষ দিকে কৃষি সংকট কেন বেড়ে গিয়েছিল? এই কৃষি সংকটের ফল কী হয়েছিল?

(গ) মুঘল যুগের শেষ দিকে জায়গিরদারি ও মনসবদারি ব্যবস্থায় কেন সংকট তৈরি হয়েছিল? মুঘল সাম্রাজ্যের উপর এই সংকটের কী প্রভাব পড়েছিল?

(ঘ) সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থা বিষয়ে তোমার মতামত কী?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) ধরো তুমি একজন মারাঠা সর্দার। তোমার সঙ্গে একজন জাঠ কৃষকের দেখা হয়েছে। মুঘল শাসনের নানা দিক নিয়ে ঐ জাঠ কৃষকের সঙ্গে তোমার একটি কথোপকথন লেখো।

(খ) ধরো তুমি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারের একজন ঐতিহাসিক। তুমি মারাঠা, শিখ, জাঠ ও সৎনামিদের লড়াইয়ের ইতিহাস লিখছো। কীভাবে তুমি তোমার লেখায় এই লড়াইগুলির ব্যাখ্যা করবে?

(গ) ধরো তুমি একজন অভিজাত জায়গিরদার। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে তোমার সঙ্গে তোমার জমির কৃষকদের সম্পর্ক নিয়ে একটি সংলাপ লেখো।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

নবম অধ্যায়

আজকের ভারত

সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন

এতক্ষণ যা যা পড়া হলো, সেসব ছিল পুরোনো দিনের কথা। কিন্তু, সেই পুরোনো অনেক কিছুর ছাপ এখনও আমাদের উপরে পড়ে। পুরানো দিনের অনেক শব্দ এখনও আমরা ব্যবহার করি। পুরোনো দিনের অনেক ধারণা এখনও আমাদের চারপাশে রয়েছে। শুধু সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে ধারণাগুলি আরও বদলেছে মাত্র। তবে তার ভেতরের মূলকথাটা অনেক ক্ষেত্রে একই রয়ে গেছে।

তেমনই একটা ধারণা 'সরকার'। সরকার শব্দটা ফারসি থেকে এসেছে। মধ্যযুগে ভারতে এই শব্দটির মানে শাসনকর্তা বা শাসনব্যবস্থা—দুই হতো। এই সরকার শব্দটা আজও আমরা ব্যবহার করি। ইংরেজিতে এর সমান শব্দ হলো Government (গভর্নমেন্ট)। Govern মানে শাসন করা।

আমরা যে দেশে এখন বাস করি, সেই ভারতেও একটা সরকার আছে। সব স্বাধীন দেশেই সরকার থাকে। আগে ক্ষমতার জোরে যুদ্ধে জিততেন যিনি, তিনিই শাসন করতেন। এখন দেশের লোকেরা নিজেরা ঠিক করেন কে বা কারা দেশশাসন করবে। নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে শাসক বেছে নেওয়ার এই পদ্ধতিকেই বলে 'গণতন্ত্র'। 'তন্ত্র' মানে ব্যবস্থা। লোকজন বা জনগণ নিজেরাই দেশের তন্ত্র বা ব্যবস্থা ঠিক করেন বলেই এটা গণতন্ত্র। এইভাবে জনগণ যাদের বেছে নেন দেশ চালাবার জন্য, তারা মিলেই হয় সরকার।

বলোতো অনেক আগে বাংলায় একবার প্রজারাই তাদের রাজাকে বেছে নিয়েছিলেন। কে সেই রাজা ? এর উত্তর লুকিয়ে আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

মনে রেখো

এর আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা রাজা, সুলতান, বাদশাহের কথা পড়েছি। তাদের শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। এখনও কোনো কোনো দেশে রাজা-রানি আছেন। যেমন ইংল্যান্ড, জাপান। তবে সেসব দেশেও গণতান্ত্রিক সরকার আছে। জনগণ সেখানে নিজেরাই সরকার বেছে নেন। ভারতে রাজা-রানি নেই। এখানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী আছেন।

প্রত্যেক দেশ কীভাবে চলবে তার নিয়মকানুন আছে। এই নিয়মকানুনকেই 'সংবিধান' বলা হয়। 'বিধান' শব্দটার মানেই নিয়ম। বেশিরভাগ দেশেরই সংবিধান আছে লিখিত আকারে। আবার কোনো কোনো দেশে তা লেখা নেই। সেখানে বহু বছর ধরে চলে আসা নিয়মগুলোই মেনে নেওয়া হয়।

ছবি ৯.১ :

ড. বি. আর. আম্বেদকর
জন্ম : ১৮৯১খ্রিঃ
মৃত্যু : ১৯৫৬খ্রিঃ

ভারতের একটি লিখিত সংবিধান আছে। ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সংবিধান। এত ধারা-উপধারা আর কোনো দেশের সংবিধানে নেই। এই সংবিধানের প্রধান রূপকার ড. বি. আর. আম্বেদকর। ভারতীয় সংবিধানে দেশের সরকার বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের জনগণের অধিকারকেই স্বীকার করা আছে। সেই অধিকার মেনেই প্রতি পাঁচ বছর পরে পরে দেশে একবার নির্বাচন হয়। যাকে চলতি কথায় 'ভোট হওয়া' বলে। সেই নির্বাচনে ভোট দিয়ে দেশের মানুষ আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকার বেছে নেন।

টুকরো কথা

ভারতের সংবিধান

প্রায় তিন বছর আলোচনা-বিতর্কের পরে ভারতের সংবিধান তৈরি হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ঐ সংবিধান কার্যকর হয়। ২৬ জানুয়ারি 'প্রজাতন্ত্র দিবস' পালন করা হয়।

ভারত একটা বিশাল দেশ। এই দেশে একটাই কেন্দ্রীয় সরকার আছে। আবার প্রতিটা রাজ্যের নিজস্ব সরকার আছে। তাদের বলা হয় রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দুটোই জনগণ বেছে নেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্বাচন করেন দেশের সমস্ত জনগণ। রাজ্য সরকারকে নির্বাচন করেন ঐ রাজ্যের বাসিন্দারা।

সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার দুয়েরই কী কী ক্ষমতা, তা বলা আছে। যে শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দু-রকম সরকারের ক্ষমতাই স্বীকার করা হয়, তাকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা। ফলে, ভারতের সরকার একদিকে গণতান্ত্রিক— কারণ জনগণ নিজেরা শাসক বেছে নেন। আবার অন্যদিকে তা যুক্তরাষ্ট্রীয়— কারণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দু-ধরনের সরকারই এই শাসনব্যবস্থায় আছে।

'সরকার' ধারণাটি তার কাজের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে, সরকারের কাজ কী— এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। খুব সাধারণভাবে বললে, সরকারের কাজ হলো দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। জনগণের যাতে ভালো হয় তার জন্য নানান উদ্যোগ নেওয়া, কর সংগ্রহ করা, দেশের স্বাধীনতা বজায়, রাখা। দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য সরকার কাজ করবে। আর এইসব কাজে সরকারকে পথ দেখাবে সংবিধান। সংবিধান মেনেই সরকার দেশ শাসন করবে।

সরকারের কাজকর্মকে চালানোর জন্য তিনটি বিভাগ করা হয়েছে। আইন বিভাগ,যেখানে দেশ পরিচালনার আইন তৈরি হবে। শাসন বিভাগ, ঐ আইন অনুসারে যারা দেশ পরিচালনা করবে। বিচার বিভাগ, সংবিধান অনুসারে দেশ

শাসন হচ্ছে কিনা, জনগণের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে কিনা—এসবের প্রতি নজর রাখবে। আর কেউ নিয়ম ভাঙলে, তার ব্যবস্থা নেওয়াও বিচার বিভাগের কাজ।

ছবি ৯.২ : নতুন দিল্লিতে অবস্থিত ভারতের সংসদ ভবন।

টুকরো কথা

সরকারের বিভাগ

সব দেশেই বিচার বিভাগকে বাকি দুটি বিভাগের (আইন ও শাসন) থেকে আলাদা রাখা হয়। কোনোভাবেই যাতে সুবিচারের পথ বন্ধ না হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এককথায় একে বলে 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি'। 'স্বতন্ত্রীকরণ' মানে আলাদা করা। গণতন্ত্র যাতে বলবৎ থাকে, তার জন্যই এই নীতি নেওয়া হয়। ফ্রান্সের দার্শনিক মন্তেস্কু প্রথম এই নীতির কথা বলেন।

বলোতো, বর্তমানে ভারতের সরকার যদি হয় গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, তাহলে সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতের সরকার কেমন ছিল?

ভারতের জনগণ শুধু শাসক নির্বাচন করেন না, নিজেরাও শাসনে অংশ নেন। সরাসরি শাসনে অংশ নেওয়াকেই বলে 'স্বায়ত্তশাসন'। 'স্ব' মানে নিজের আর 'আয়ত্ত' মানে অধীন। জনগণ যেখানে নিজেই নিজের অধীন সেই শাসন ব্যবস্থাকে বলে 'স্বায়ত্তশাসন'। পশ্চিমবঙ্গে এই স্বায়ত্তশাসন দু-ভাবে দেখা যায়। শহর বা নগরের ক্ষেত্রে পৌরসভা, আর গ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত।

ছোটো ছোটো শহরে বা নগরে পৌরসভা আছে। 'পৌর' কথাটা এসেছে 'পুর' থেকে। সংস্কৃতে পুর মানে নগর। ঐ শহর বা নগরের আঠারো বছর বা তার বেশি বয়সের বাসিন্দারা ভোট দিয়ে পৌরসভার সদস্যদের বেছে নেন। এঁদের পৌরপ্রতিনিধি বলে। এঁদের মধ্যে একজন পৌরপ্রধান হন। শহর বা

নগরের জনসেবা, জনস্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও প্রশাসন এগুলির দেখভাল করাই পৌরসভার কাজ। পানীয় জল সরবরাহ করা, রাস্তাঘাট বানানো, দূষণ রোধ করা, এসবই পৌরসভাগুলি করে থাকে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি বানিয়ে শিক্ষার প্রসারে ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে পৌরসভাগুলি উদ্যোগ নেয়।

শহর বা নগরে পৌরসভার মতোই গ্রামে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের বসিন্দারা ভোট দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচন করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন হন পঞ্চায়েত প্রধান। গ্রামের সবরকম উন্নতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ। পানীয় জলের সরবরাহ, গ্রামের পরিচ্ছন্নতা, পথ-ঘাট নির্মাণ এসবই গ্রাম পঞ্চায়েত করে। আবার শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় করা, চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করা, বনসৃজন করা— এসবও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের মধ্যে পড়ে।

অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে একটা 'ব্লক' হয়। সেই ব্লকে একইভাবে একটা পঞ্চায়েত সমিতি থাকে। আবার কয়েকটি ব্লক নিয়ে হয় 'জেলা'। জেলায় থাকে জেলাপরিষদ। গ্রামের মতোই ব্লক ও জেলার স্বায়ত্তশাসনের ভার থাকে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদের উপরে।

পৌরসভা হোক বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা—সবেতেই পাঁচ বছর অন্তর জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। আবার এই দুই ক্ষেত্রেই নানাভাবে জনগণ নিজেরাও শাসনব্যবস্থা ও নানা কর্মসূচিতে অংশ নেন।

এভাবেই জনগণের সরাসরি যোগদানের মধ্যে দিয়েই শহর বা নগর ও গ্রামের গণতন্ত্র জোরদার হয়ে ওঠে।

তুমি পৌরসভা এলাকায় থাকো না পঞ্চায়েত এলাকায় থাকো? তোমার এলাকায় কি বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে? কতগুলি খেলার মাঠ বা পার্ক আছে? কীভাবে তোমরা পানীয় জল পাও? বন্ধুরা সবাই মিলে এসবের খোঁজ নিয়ে নাও।

টুকরো কথা

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র ব্যাপারটা কিন্তু নতুন ধারণা নয়। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের কথা। গ্রিস দেশে এথেন্সের লোকেরা তাদের মধ্য থেকে শাসক বেছে নিত। শোনা যায় যে, লোকেরা ভাঙা কলসির টুকরোর উপর পছন্দমতো চিহ্ন এঁকে আরেকটা আস্ত কলসির মধ্যে ফেলে দিত। যার পক্ষে বেশি কলসির টুকরো জমা পড়ত, সেই হতো শাসক।

একটা পৃথিবীর মানচিত্র নাও। এবার তার মধ্যে থেকে গ্রিস ও এথেন্স খুঁজে বের করো।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) (বাংলাদেশ/জাপান/ফ্রান্স) ____________ এ এখনও রাজা-রানি আছেন।

(খ) নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে শাসক নির্বাচনের পদ্ধতিকে বলে ____________ (গণতন্ত্র/রাজতন্ত্র/যুক্তরাষ্ট্র)।

(গ) (ভারতের/জাপানের/ইংল্যান্ডের) ____________ সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান।

(ঘ) জনগণ যে শাসনব্যবস্থায় নিজেই নিজের অধীন, তাকে বলে ____________ (সংবিধান/সভা ও সমিতি/স্বায়ত্তশাসন)।

(ঙ) অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে হয় একটা ____________ (ব্লক/জেলা/পৌরসভা)।

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

'ক' স্তম্ভ	***'খ' স্তম্ভ***
সরকার	গ্রিস
ড. বি.আর. আম্বেদকর	স্বায়ত্তশাসন
যুক্তরাষ্ট্র	ভারতীয় সংবিধান
এথেন্স	ফারসি
জেলাপরিষদ	ভারত

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) বর্তমান ভারতে শাসনব্যবস্থার কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

(খ) যুক্তরাষ্ট্র ও সংবিধান কাকে বলে?

(গ) সরকারের কাজ কী কী?

(ঘ) স্বায়ত্তশাসন বলতে তুমি কী বোঝো?

(ঙ) নির্বাচনকে সাধারণ ভাবে কী বলে? ভারতে কত বছর অন্তর সরকার নির্বাচন হয়? সরকার নির্বাচনের সঙ্গে গণতন্ত্রের কী সম্পর্ক?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) ভারতকে কেন গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা হয়? দেশ পরিচালনায় সংবিধানের ভূমিকা কী বলে তুমি মনে করো?

(খ) সরকারের কয়টি ভাগ? ঐ ভাগগুলি কোনটি কী কাজ করে? বিচার বিভাগকে কেন আলাদা করে রাখা হয়?

(গ) পৌরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কী কী কাজ করে?

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বিষয়ে একটি টীকা লেখো।

(ঙ) প্রাচীনকালে ভারতে ও অন্য কোথাও গণতন্ত্রের কথা জানা যায় কী? সেই গণতন্ত্র কেমন ছিল বলে তুমি মনে করো?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) ধরো তুমি একজন পৌর-প্রতিনিধি/পঞ্চায়েত সদস্য। তোমার স্থানীয় অঞ্চলের উন্নতি করার জন্য তুমি কী কী কাজ করবে, শ্রেণিকক্ষে যুক্তিসহ একটি বক্তৃতা পেশ কর।

(খ) ধরো তুমি ভারতের একজন সাধারণ মানুষ। তুমি তোমার অঞ্চলের উন্নতি করতে চাও। কী কী ভাবে তুমি সেই উন্নতির পরিকল্পনা করবে, শ্রেণিকক্ষে যুক্তিসহ একটি বিতর্কের আয়োজন কর।

(গ) ধরো পাল যুগের বাংলার একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে তোমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছে। তোমরা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এসব নিয়ে গল্প করছো। তোমাদের সেই কথাবার্তা নিয়ে সংলাপ লেখো।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

শিখন পরামর্শ

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির সপ্তম শ্রেণিতে পঠন-পাঠনের জন্য *অতীত ও ঐতিহ্য* বইটি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হলো।
- বিগত ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখার (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫) নির্দেশ অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয় প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি এবং মানচিত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষের মধ্য যুগের ইতিহাসের (আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিত মনে রেখে এই বইতে বাংলার ইতিহাসের ওপর আলাদা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (বিশেষত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে)।
- এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিক ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অথবা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্যভাবেও অধ্যায়গুলি সাজিয়ে নিতে পারে। যেমন পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অষ্টম অধ্যায়গুলি একসঙ্গে পড়া যেতে পারে।
- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি ১০০টি 'টুকরো কথা' শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরন্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। কল্পনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মধ্যে ১১, ১৩, ১৫, ৩৯, ৫০, ৭৩, ৮৪, ৮৬, ১১৮, ১১৯ এবং ১৬২ পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' অংশগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে ধরতে হবে। এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।
- প্রতি পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা রইল। তাদের ভাবনাচিন্তা তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে দেবেন।
- বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে। যেমন, চতুর্থ অধ্যায়ে দিল্লি সুলতানির সম্প্রসারণের কোনো ধারাবিবরণী না দিয়ে কেবল একটি মানচিত্রে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুটি রেখচিত্রের সাহায্যে মধ্যযুগের ভারতের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কথা এবং ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানির আমদানি-রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
- এই বইটির একটি বড়ো সম্পদ এর ছবিগুলি। ছবিকে সব সময়েই ধারাবিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন চিত্র নয়, এগুলি মূল ধারাবিবরণীরই অঙ্গ।
- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তার সাল-তারিখ। এই বইতে শিক্ষার্থীদের নীরস ভাবে সাল-তারিখ মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয়নি। রাজা-বাদশাহের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে এমন কোনো দাবিও আমাদের নেই। সাধারণভাবে শাসক বংশগুলির বিশ [illegible] ারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শি [illegible] এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- পঠন-পাঠনের একটি [illegible] জন নানা রকমের কৃত্যালি ও প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ে [illegible] া খুঁজে দেখোর কল্পনা করে লেখো শীর্ষক কৃত্যালি [illegible] uation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি [illegible] াছে, যার আদলে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নিজেরাই [illegible] নির্দেশ করছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাস [illegible] শ্ন অনুশীলনীতে রাখা হয়নি। মূল্যায়নের সময় এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন রাখা যাবে না। প্রত্যেক অনুশীলনীতে 'কল্পনা করে লেখো' অংশে কয়েকটি কাল্পনিক প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশক্তিকে পরখ করা। তবে মূল্যায়নের সময় এই অংশের প্রশ্নগুলি রাখা যাবে না।

- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অষ্টম ও নবম অধ্যায়/(**এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে**)। (**বি.দ্র.: ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যাযক্রমিক মূল্যায়নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না**। ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে। চতুর্থ অধ্যায়ে সেই রকম একটি দিকনির্দেশ করা হয়েছে।